Islamic Online Madrasha (IOM)
AQD101 Module:10
Majharul Islam Sayed

আরকানুল ঈমান পর্বঃ রিসালাত-২

মুহাম্মদ সাঃ প্রসঙ্গ

১. মুহাম্মদ সাঃ এর পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী
২. তার প্রতি ঈমানের মৌলিক অর্থ
৩. তার রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ
৪. খতমে নবুওয়াত

মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য বিশ্বাস করা। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তিনি আল-াহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বাসের যে সকল দিক শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমরা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

(১) তাঁর নুবুওয়াতের বিশ্বাস। অর্থাৎ তিনি নুবুওয়াত পেয়েছেন, তাঁর নুবুওয়াত সর্বজনীন, তাঁর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপুর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল।

(২) তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, তাঁর অনুসরণ মু ক্তির পর্থ এবং তাঁর রীতির ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী।

(৩) তাঁর মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস, মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার পূর্ণতায় বিশ্বাস, তাঁকে ভালবাসার অপরিহার্যতা এবং তাঁর কারণে তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ এবং তাঁর আনুগত্যে-অনুসরণে অগ্রগামীদের ভালবাসা।

নিম্নে রিসালাতের বিশ্বাসের এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব।

মুহাম্মাদ (সা.)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু বলেছেন সবকিছুকে সন্দেহাতীত বলে সত্য বিশ্বাস করা। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিশ্বাসের যে সকল দিক শিক্ষা দিয়েছেন তা আমরা নিম্নের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

(১) তাঁর নুবুওয়াতের বিশ্বাস। অর্থাৎ তিনি নুবুওয়াত পেয়েছেন, তাঁর নুবুওয়াত সর্বজনীন, তাঁর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপুর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল।
(২) তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য, তাঁর অনুসরণ মুক্তির পর্থ এবং তাঁর রীতির ব্যতিক্রম ঈমান বিধ্বংসী।
(৩) তাঁর মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ মর্যাদায় বিশ্বাস, মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার পূর্ণতায় বিশ্বাস, তাঁকে ভালবাসার অপরিহার্যতা এবং তাঁর কারণে তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ এবং তাঁর আনুগত্যে-অনুসরণে অগ্রগামীদের ভালবাসা।

নিম্নে রিসালাতের বিশ্বাসের এ বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাত

একজন মুসলিম সন্দেহাতীতরূপে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দিতে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কল্যাণ শিক্ষা দিতে এবং অকল্যাণ থেকে সতর্ক করতে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহর তাঁকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার
দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫-৪৬

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন। সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৭

২. তাঁর নুবওয়াতের সর্বজনীনতা

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না। আল্লাহ বলেছেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক রাসূল উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।" সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৮

৩. খাতমুন নুবুওয়াত বা নুবুওয়াতের সমাপ্তি

একজন মুসলিম আরো বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। বস্তুত, কুরআন ও হাদীসের এ বিষয়ক কোনো ঘোষণা না থাকলেও কয়েকটি কারণে মুহাম্মাদ (সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হতাম।

প্রথমত, সকল নবীই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর পরে অন্য নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আগমন করবেন, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করে মানুষদেরকে জানাবেন। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীস শরীফে কখনো কোনোভাবে জানান নি যে, তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে কোনো নবী, রাসূল বা বার্তাবাহক আসবেন। এ বিষয়টিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী -রাসূলদের দাওয়াত ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য। এজন্য তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহী চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতো না। কাজেই তাঁদের পরে নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। মুহাম্মাদ (সা.)এর দীনের সর্বজনীনতা ও পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে বারংবার এবং তাঁর দীনকে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাজেই এরপর আর কোনো নতুন নবীর আগমন নিষ্প্রয়োজন।কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ

হয় নি। উপরন্তু কুরআন কারীমে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী। অসংখ্য হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহ -এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

"আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ এক ব্যক্তির মত যিনি একটি খুবই সুন্দর ও মনোরম ইমারত তৈরী করেছে, কিন্তু ইমারতের এক দিকে একটি ইটের জায়গা খালি রেখেছেন। মানুষেরা আশ্চর্য হয়ে এই মনোরম ইমরতটির চারিদিকে ঘুরতে থা কে এবং বলতে থাকেঃ এ ইটটি যদি স্থাপন করা হতো! তিনি বলেনঃ আমিই এই সর্বশেষ ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।"

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

"আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল। তারা বলতে লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি টনেছি।

অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

"আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি 'মাহী' (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আহ কুফ্‌র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি 'হাশির' (একত্রিতকারী), আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং আমি 'আকিব' (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।"

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেনঃ

"রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুবুওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।"

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল,

তাঁর আগমনের সাথে সাথে নুবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না।তিনি একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর পরে যদি কেউ নুবুওয়াতের দাবী করে তবে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী; ভণ্ড। বিভিন্ন হাদীসে তিনি তাঁর উম্মতকে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেন

“নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর মিথ্যাবাদীর (ভণ্ড নবীর) আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।”

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বরং প্রকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ -এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুবুওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত। যারা তাঁর নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তাঁরাই তাঁর খাতমুন নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে নবুওয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে নুবুওয়াতের দাবি করে কেউ ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। কারণ এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সচেতনতা ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী যাবত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকগণের কূটকৌশলের কারণে এ সকল ভণ্ড মুসলিম সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে এবং অসংখ্য মুসলিমকে ধর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ভণ্ডের অন্যতম পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ খৃ)।

এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমদ ও তার মত ভণ্ড নবীরা সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে নি; কারণ তাহলে কোনো মুসলিমই তার দাবি গ্রহণ করবে না। বরং তারা প্রথমে বেলায়াত, কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি দাবি করে। এরপর তারা নিজেদেরকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। এগুলি সবই ইসলামী পরিভাষা ও ইসলাম স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু এগুলির অর্থ ও মর্ম না জানার কারণে অনেকেই এ সকল কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এভাবে তারা যখন কিছু মানুষকে তাদের একান্ত ভক্ত হিসেবে পেয়ে যায়, তখন বিভিন্ন কৌশলে নুবুওয়াত দাবি করে। আর তার অনুসারী ভক্তরা বিভিন্ন অজুহাত ও ব্যাখ্যা দিয়ে তার দাবি মেনে নেয়। এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, খাতমুন নুবুওয়াতের একটি দিক এই যে, ইসলামকে জানতে, বুঝতে, ব্যাখ্যা

করতে বা বিধান দিতে রাসূলুল্লাহ -এর পরে আর কোনো ‘ব্যক্তির’ কোনো ‘ইসমাত’ (অভ্রান্ততা), কাদাসাত (পবিত্রতা) বা বিশেষ পদমর্যাদা নেই।

৪. তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতা

একজন মুসলিম সর্বান্ড়করণে বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ (সা.) পরিপূর্ণ বিশ্বস্ড়তার সাথে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বজনীন নবী ও রাসূল হিসাবে তার নুবুওয়াতের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কোনো কিছুই তিনি গোপন করেন নি। আমরা দেখেছি আল্লাহ তাকে প্রচারের দায়িত্ব দান করে বলেছেন:

”হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না।”

নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করেছেন এবং তাঁর প্রচারের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

“আর (কাফিরেরা) যদি আপনার আহবানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষাকর্তারূপে প্ররণ করি নি। আপনার উপরে তো শুধু প্রচারের দায়িত্ব।” সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৪৮

এরপর আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে নিম্নের আয়াত নাযিল করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলাম কে তামাদের দীন মনোনীত করলাম।”   সূরা মায়িদা, আয়াত-৬

অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে মুহাম্মাদ সা.

বাইবেলে মুহাম্মদ সাঃ এর ভবিষ্যতবাণী

Deutaronomy (দ্বিতীয় বিবরণ) এর ১৮ তে বলা হয়েছে,

I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him.

মুসা আ. বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আমাকে বললেন: “তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত একজন নবীকে প্রেরণ করা হবে। আমি তার মুখে আমার কথা দিয়ে দেব। তিনি আমার নির্দেশিত বাণী দিয়ে কথাবার্তা বলবেন। আর যারা তার মুখস্থিত আমার কথা না শুনবে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব।”
(দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৮-১৯)
উক্ত উক্তির সারাংশ হলো– আবির্ভূত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. তিনি হবেন মুসা আ. এর মত।

২. তিনি ইসরাইলীদের ভাইদের তথা ইসমাইলিয় বংশ থেকে আসবেন।

৩. আল্লাহ তা ‘আলা নিজ বাণীকে তার মুখে দিয়ে দিবেন। তিনি তার নির্দেশিত বিষয়সমূহ মানুষকে জানিয়ে দিবেন।

এবার আসুন! আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও চিন্তা করি।

১. মুসা আ. এর মত নবী:

মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার যেমন মিল রয়েছে অন্যান্য নবীদের মধ্যে সে রকম মিল অন্য দু ‘জন নবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। তারা উভয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। তারা প্রত্যেকেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে আশ্চর্যজনকভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন নবী ও রাষ্ট্রপ্রধান। এবং তারা প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভূমি থেকে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে হিজরত (যাত্রা) করেছেন।

ঈসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উপরের মত মিল নেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিল নেই যেমন– স্বাভাবিক জন্ম, পারিবারিক জীবন এবং মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত স্বাভাবিক মৃত্যু; যেহেতু ঈসা আ. ইন্তেকালই করেন নি।

মুসা আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকের উম্মতেরা তাদেরকে যেমন আল্লাহ তা ‘আলার নবী মনে করেন; ঈসা আ. এর অনুসারীরা তাকে তেমন নবী মনে করে না বরং আল্লাহ তা ‘আলার পুত্র মনে করে। এ ছাড়া মুসলিমরা ঈসা আ. কেও আল্লাহ তা ‘আলার নবী বলে বিশ্বাস করে।

প্রসিদ্ধ হিন্দু শাস্ত্র গুলো থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয়:

হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী মোট চারটি: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

এই চারজন মিলে মোট ১০ জন অবতার আসবেন। সর্বশেষ কলির যুগে একজন অবতার আসবেন। কলির যুগের অবতার হিসেবে হিন্দু শাস্ত্র মতে কল্কি অবতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তার মানে কল্কি অবতার হলো সর্বশেষ অবতার আমাদের ভাষায় সর্বশেষ নবী।

হিন্দু শাস্ত্র মতে কল্কি অবতারের নাম হবে নরাশংস।

নরাশংসং সৃদৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং দিবো ন সদ্মমখসম। -ঋগ্বেদ ১ নং মন্ডল ১৮ নং ৯ মন্ত্র

এখানে অন্তিম যুগীয় অবতারের নাম নরাশংস বলা হয়েছে। কলকাতার হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ঋগ্বেদ সংহিতা (পরিমার্জিত সংস্করণ-২০০৪) ৬৯ নং পৃষ্টায় নরাশংস শব্দের অর্থ করা হয়েছে মানব প্রশংসিত।

উক্ত নামের মাঝে দুটি অংশে রয়েছে। ১. নর (মানব) ২. আশংস (প্রশংসিত)। সুতরাং নরাশংস অর্থ মানব প্রশংসিত। যার আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে মোহাম্মাদ।

অবতারের পিতা-মাতা ও জন্মস্থানের নামঃ

কল্কিপুরাণ ১নং পরিচ্ছেদ ২নং অধ্যায় ৪ নং মন্ত্রে আছে_

" সম্ভলে বিষ্ণুযশসাে গৃহে প্রাদুর্ভাম্যহম্
সুমত্যাং মাতরি বিভাে কন্যায়াংত্বন্নিদেশতঃ"

অর্থ: সম্ভল নামক স্থানে বিষ্ণুযশা নামক বিপ্রের গৃহে তাহার পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরানৎ ১২ নং স্কন্দ ২ নো অধ্যায় ১৮ নং মন্ত্রে আছে-

" সুমত্যাং বিষ্ণুযশসাে গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্ "

অর্থ: অতঃপর বিষ্ণুযশার পত্নী সুমতিতে বৈষ্ণব গর্ভের উদয় হইবে ।

**গর্ভাবস্থায় অবতারের প্রতি গ্রহ - নক্ষত্রের সম্মান প্রদর্শন ।

কল্কিপুরাণ - ১নং পরিচ্ছেদ ২নং অধ্যায় ১১নং মন্ত্রে আছে

"গ্রহ-নক্ষত্র রাশ্যাদি সেবিত শ্রীপদামুজম।"

অর্থ: গ্রহরাশি নক্ষত্র সে গর্ভ সন্তানের শ্রদ্ধায় বন্ধনা করিবে।

কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ

কল্কিপুরাণ - ১নং পরিচ্ছেদ ২নং অধ্যায় ১৫নং মন্ত্রে আছে- "দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ"

অর্থ: মাধব মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মাধবের (কল্কি অবতারের) ধরণীতে আগমন ঘটবে।

মুহাম্মাদ সা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ পরিচয়ঃ

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশ সারা বিশ্বের সেরা ও উত্তম বংশ। আপন পর সবাই অকপটে তা স্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চ বংশোদ্ভত হওয়ার দিকে ইঙিগঁত করে বলেছেনঃ "আল্লাহ তাঁর রিসালত বা পয়গামের দায়িত্ব কাকে দিচ্ছেন সে ব্যাপারে অনেক জ্ঞাত।" (সূরা আন আমঃ ১২৪)

আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহনের পূর্বে) যখন রোমের সম্রাটের কাছে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিচ্ছিল তখন সেও বলেছিল যে, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি। তখন রোম সম্রাট হিরাকল বলেছিলেনঃ "তেমনি নবী রসূলগণ সর্বোচ্চ বংশ ও গোত্রে প্রেরীত হয়ে থাকেন।" (সহীহ সীরাতুন নব্বীয়াহ, পৃঃ ৯।)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেনঃ "আমি বনী আদমের সর্বোত্তম বংশে প্রেরীত হয়েছি। আমার যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।"(সহীহ আল বুখারীঃ ৪/১৫১)

অপর এক হাদীসে আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তাআলা কিনানা গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেন, আবার কুরাইশদের থেকে বনু হাশিমকে বাছাই করেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেন।" (মুসলিম শরীফ (২২৭৬), তিরমিযী শরীফ (৩৬০৬), মুসনাদু আহমদঃ ৮/১০৭, হা/ ১৭১১১, , সিলসিলা সহীহাঃ ৩০২।)

পবিত্র বংশধারাঃ

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বংশধারা নিম্নরূপঃ

মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু আব্দিল্লাহ, ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, ইবনু হাশিম, ইবনু আব্দিমানাফ, ইবনু কুছাই, ইবনু কিলাব, ইবনু মুররাহ, ইবনু কাআ'ব, ইবনু লুওয়াই, ইবনু গালিব, ইবনু ফেহের (কুরাইশ), ইবনু মালিক, ইবনু নযর, ইবনু কিনানা, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু মুদরিকাহ, ইবনু ইলিয়াস, ইবনু মুদ্বার, ইবনু নাযার, ইবনু মাআ'দ, ইবনু আদনান, ইবনু আদু, ইবনু মাইসা', ইবনু সালামান, ইবনু এওয়ায, ইবনু বূয, ইবনু ক্বামওয়াল, ইবনু উবাই, ইবনু আওয়াম, ইবনু নাশিদ, ইবনু হাযা, ইবনু বিলদাস, ইবনু ইয়াদলাফ, ইবনু ত্বাবিখ, ইবনু জাহিম, ইবনু নাহিশ, ইবনু মাখী, ইবনু আইফী, ইবনু আবকার, ইবনু উবাইদ, ইবনু আলদুআ', ইবনু হামদান, ইবনু সাবজ, ইবনু ইয়াসরাবী, ইবনু ইয়াহযান, ইবনু ইয়ালহান, ইবনু আরআওয়া, ইবনু আইফা, ইবনু যীশান, ইবনু আইসার, ইবনু আকনাদ, ইবনু ইহাম, ইবনু মুকছির, ইবনু নাহিছ, ইবনু যরাহ, ইবনু সুমাই, ইবনু মযযী, ইবনু ইওয়ায, ইবনু আরাম, ইবনু কায়দার, ইবনু ইসমাঈল, ইবনু ইবরাহীম, ইবনু তারা (আযর), ইবনু নাহুর, ইবনু সারুজ, ইবনু রাউ, ইবনু ফাইজ, ইবনু আবির, ইবনু আরফাকশাও, ইবনু সাম, ইবনু নূহ, ইবনু লামক, ইবনু নাতুশাইহ, ইবনু আখনূ', ইবনু ইদ্রিস, ইবনু ইয়ারিদ, ইবনু মালহালঈল, ইবনু কায়নান, ইবনু আনূশ, ইবনু শীছ, ইবনু আদম আলাইহিসসালাম। -(রাহমাতুল্লিল আলামীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৫-৩১, কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনছুরপূরী)

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতা পিতা পর্যন্ত নারী পুরুষের যতগুলি স্তর রয়েছে প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি নারী ও পুরুষ সৎ ও পবিত্র ছিলেন। কেউ কখনো ব্যবিচারে লিপ্ত হন নি। রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি বিবাহের মাধ্যমে জন্ম গ্রহন করেছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়।

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমার পিতা মাতা পর্যন্ত কোন নারী পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হননি। আর জাহেলী যুগের ব্যভিচার আমাকে চুয়েঁ নি।" (ইরওয়াউল গালীলঃ ১৯৭২, সহীহুল জামিউস্ সাগীরঃ ৩২২৫।)

আব্দুল্লাহ ও আমেনাঃ

কুরাইশ সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের ছিল দশ পুত্র। এদের সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। তাঁর সকল পুত্রের মধ্যে আব্দুল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা বিয়ে দিয়েছিলেন বনূ যুহরার সর্দার ওহাব এর কন্যা আমেনার সঙেগঁ, যাঁকে সে সময় উচ্চ বংশ, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কুরায়শদের ভিতর সবচেয়ে সম্মানিত মহিলা মনে করা হত।

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পথে মদীনা শরীফে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তথায় মৃত্যু বরণ করেন। 'দার আল্ নাবেগা আলজা'দী' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (আর রাহীকুল মাখতুম, ছফীউররাহমান মুবারকপুরী, পৃঃ ৫৩।) হযরত আমেনা তাঁর জন্মের পূর্বেই এমন বহু নিদর্শন দেখতে পান যদ্বারা বোঝা যেত যে, তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জল ও মর্যাদাকর হবে।" (নবীয়ে রহমত- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী- ১১৩)

জন্মঃ

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমুল ফীল' অর্থাৎ হস্তি বাহিনীর অভিযানের বছর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ মুতাবিক ৫৭০ খৃষ্টাব্দ সোমবার দিন সকালে জন্ম গ্রহণ করেন। এটি ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকোজ্জল ও বরকতময় দিন। ইমাম মুসলিম তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহু মুসলিম'-এ হযরত আবুকাতাদা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক বেদুইন বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! সোমবারে সিয়াম (রোযা) পালন সম্পর্কে কি বলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ এটি সে দিন যাতে আমার জন্ম হয়েছে এবং এতেই আমার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিমঃ হা/নং ১১৬২।)

উল্লেখ্য যে, রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে অনেক উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রাহ) বলেনঃ "ইমাম মালিক (রাহ) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসরা প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুৎইম থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম তারিখ হল, রবিউল আওয়ালের ৮ তারিখ। অনেক ঐতিহাসিকগণ একথাকেই সঠিক মনে করেছেন। হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে মূছা আল খাওয়ারযমী এউক্তিকে অকাট্য বলেছেন। আর ইবনে দেহয়াহ এউক্তিকে প্রধান্য দিয়েছেন।"(সহীহুস সীরাতিন নববীয়্যাহ, টীকা, পৃঃ ১৩।) মিসরের প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্র বিশারদ মাহমূদ পাশা একটি পুস্তিকা রচনা করেন যাতে তিনি গণিত বিদ্যার অকাট্য দলীল প্রমাণাদী দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম তারিখ হল রবিউল আওয়ালের ৯ তারিখ মুতাবিক ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। (সীরাতুন্নবী আল্লামা শিবলী পৃঃ ১০৮)

নাম করণঃ

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম হতেই মা আমেনা এসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে পাঠান। সংবাদ পেতেই তিনি ছুটে আসেন, পরম স্নেহে দেখেন, যত্নের সঙেগঁ কোলে নিয়ে কা'বার ভেতর প্রবেশ করেন, আল্লাহর হামদ বর্ণনা করেন এবং দোয়া করেন। অতঃপর তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ'। আরবে এনাম ছিল একেবারেই নতুন। ফলে লোকেরা খুব বিস্মিত হয়। (সীরাতে ইবনে হিশামঃ ১/১৫৯-৬০, ইবনু কাছীরঃ ১/২১০।)

যুবাইর ইবনে মুতায়িম (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি মুহাম্মদ, আহমদ, হাশির, আকিব, মাহি এবং খাতম।" (মুসনাদে আহমদঃ ৪/৮১,৮৪/ ১৬৮৬৯,১৬৮৯২।)

দুগ্ধ পান কালঃ

সর্ব প্রথম তাঁকে তাঁর মাতা হযরত আমেনা দুগ্ধ পান করান। অতঃপর আবু লাহাবের বাঁদী 'য়ুওয়াইবা' তাকে দুগ্ধ পান করায়। অতঃপর ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। 'হাওয়াযিন' গোত্রের বানী সা'দ এর মহিলা হযরত হালীমা ছা'দিয়া এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এমন ভাবে যে, অন্য কোন ধাত্রী শিশু মুহাম্মদকে গ্রহণ করলনা পক্ষান্তরে হালীমা সাদীয়াও অন্য কোন শিশু পেলনা। ফলে বাধ্য হয়ে রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করার পর থেকেই হালীমার ঘরে ইলাহী বরকতের জোয়ার শুরু হল। দুবছর দুগ্ধ পানের পর বিবি হালীমা শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে তাঁর মার নিকট হাজির হন এবং সাথে সাথে এই আকাঙ্খাও ব্যক্ত করেন যে, শিশুকে আরো কিছু দিনের জন্য তাঁর নিকট যেন থাকতে দেয়া হয়। এদিকে মক্কা শরীফে তখন মহামারী চলছিল। উভয় দিক চিন্তা করে বিবি আমেনা তাঁর শিশুকে হালীমার নিকট ফিরিয়ে দেন। এমনি ভাবে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী সাদে লালিত পালিত হন। সেখানে তিনি তাঁর দুধ ভাইদের সঙেগঁ জঙগঁলে ছাগল চরাতেন। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, সীরাতুননবীঃ ১/১৭২।)

হালীমা সাদীয়ার পরিবারঃ

হযরত হালীমা সাদীয়ার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছিল তাঁর স্বামী হারিছ ইবনু আব্দিল উয্যা এবং তাঁর চার সন্তান আব্দুল্লাহ, উনাইসা, হুযাইফা এবং হুযাফা (শায়মা)। রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পরিবারে প্রায় ছয়টি বছর অতিবাহিত করেন। হালীমা সাদীয়া (রাঃ) ও তাঁর স্বামী উভয়ে ইসলাম গ্রহন করেছেন। সন্তানদের মধ্যে আব্দুল্লাহ এবং শায়মা ইসলাম গ্রহন করেছেন। বাকী দুই জনের কথা জানা যায়নি। (সীরাতুন্নাবী-আল্লামা শিবলীঃ ১/১১৯।)

বক্ষ বিদীর্ণঃ

যখন তিনি বানী সাদে ছিলেন তখনকার এক ঘটনা। একদা তিনি জঙগঁলে ছাগল চরাতে গেলেন। তখন দুজন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁর সীনা মুবারক ফেড়ে ফেলা হয়। তাঁর পবিত্র হৃৎপিন্ড থেকে গোশতের টুকরো কিংবা মাংস পিন্ডের মত একটি কালো বস্তু বের করে তাঁরা ছুড়ে ফেললেন। অতঃপর তাঁর হৃৎপিন্ড খুব ভাল করে ধুয়ে ও পরিস্কার করে স্ব স্থানে স্থাপন করে দেন এবং তা পুনরায় পুর্বের মতই হয়ে যায়। (সিলসিলা সহীহাঃ হা/৩৭৩।) এই ঘটনার পর হযরত হালীমা রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মা আমেনার কোলে ফিরিয়ে দেন।

মদীনার সফরঃ

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন ছয় বছর চলছিল তখন মা আমেনা তাঁকে নিয়ে মদীনা সফর করলেন। সাথে ছিল উম্মে আয়মান বারাকা নামে একজন হাবশী দাসী। 'ইয়াছরিব' তথা মদীনা শরীফের নাজ্জার গোত্র ছিল তাঁর দাদার মাতৃকুল। আর রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ এর কবরও ছিল তথায়। মা আমেনা তাঁর শিশুকে নিয়ে প্রায় এক মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। (সীরাতুন্নাবী-আল্লামা শিবলী)

মাতা বিয়োগঃ

মদীনার সফর শেষে আসার পথে 'আল আবওয়া' নামক স্থানে বিবি আমেনা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে সেখানেই দাফন করা হল। অতঃপর উম্মে আয়মান তাঁকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং আল্লাহর এই আমানত দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর দাদাও এই সফরে সাথে ছিলেন।

দাদার স্নেহ ছায়ায়ঃ

তখন থেকে পিতা মাতা হারা এই শিশু দাদার স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। দাদা তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে চাইতেন, ভালবাসতেন এবং ক্ষণিকের তরেও তিনি তাঁর এই এতীম পৌত্র সম্পর্কে গাফেল হতেন না।

দাদার ইন্তেকালঃ

দুই বৎসর পর্যন্ত দাদা আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় পৌত্র মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতি আদর যত্নের সহিত লালন পালন করেন। যখন তাঁর বয়স আট বছরে উপণিত হয় তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব বিরাশী বছর বয়সে ইহদাম ত্যাগ করেন।

চাচা আবু তালিবের দায়িত্বেঃ

তাঁর দাদা ইন্তেকালের সময় নিজ পুত্র আবু তালিব কে পৌত্র মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অছিয়ত করে যান এবং তাঁকে লালন-পালন করার দায়িত্ব দিয়ে যান। আবু তালিবও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশী মায়া দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন।

সিরিয়ার সফরঃ

নয় বছর বয়সে রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে বানিজ্জিক সফরে সিরিয়া যান। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ নগরী ‘বুছরা’ নামক স্থানে পৌঁছার পর ‘বুহায়রা’ নামক এক ধর্মজাযকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। বুহায়রা বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনতে পেরে তিনি সহ তাঁর কাফেলাকে খুব বেশী খাতির যত্ন করলেন এবং আবু তালেবকে বললেন যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে মক্কায় চলে যান। ইহুদীদের হাত থেকে একে বিশেষ ভাবে হিফাজত করবেন। কারণ ভবিষ্যতে এ বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর আবুতালেব তাঁকে নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন। (সীরাতুন নব্বীয়্যাহ, পৃঃ ২৯-৩১।)

কালিমা মুক্ত পরিবেশে লালন পালনঃ

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লালন পালন বিশেষ নিরাপদ ও কালিমা মুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং জাহিলিয়াতের নাপাক ও খারাপ অভ্যাস সমূহ থেকে আল¬াহ পাক তাঁকে সর্বদাই দুরে ও মুক্ত রাখেন। তাঁকে তাঁর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে লোকেরা প্রথম থেকেই সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় গুণাবলী, উন্নত মনোবল, উত্তম চরিত্রে বিভূষিত, লাজনম্র, সত্যবাদী, আমানতদার, কটুক্তি ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ থেকে দুরে বলে মনে করত। এমন কি তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে ‘আল্ আমীন’ বিশ্বস্ত, আমানতদার নামে স্মরণ করত। তিনি আত্মীয়তার দিকে খেয়াল রাখতেন, লোকের দুর্বহ বোঝা হালকা করতেন এবং তাদের প্রয়োজন মেটাতেন। তিনি মেহমানদারী করতেন, কল্যাণমূলক ও তাকওয়া ভিত্তিক কাজে কর্মে অন্যদেরকে সাহায্য করতেন। (নবীয়ে রহমত, পৃ ১১৮।)

আল ফিজার যুদ্ধে অংশ গ্রহণঃ

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন চৌদ্দ কি পনেরো তখন কুরায়শ ও কায়স গোত্রের মধ্যে ‘আল ফিজার’ এর যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি এই যুদ্ধ খুব কাছে থেকে দেখেন। তিনি শত্র“দের নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে কুরায়শদেরকে পৌঁছে দিতেন। এমনিভাবে তিনি যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং অশ্বারোহন ও সৈনিকবৃত্তির সঙেগঁ তাঁর পরিচয় ঘটে। (সীরাত ইবনে হিশামঃ ১/১৮৬।)

খদীজা (রাঃ) এর সঙেগঁ বিবাহঃ

যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ এর সঙেগঁ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত খদীজা কুবায়শ গোত্রের খুবই প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন এবং বোধ শক্তি, দুরদর্শিতা, মহান চরিত্র ও ব্যবহার, অধিকন্তু ধন সম্পদের দিক দিয়েও খ্যাতনাম্নী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিধবা। বিয়ের সময় মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। আবু তালেব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং এখান থেকেই তাঁর দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর সন্তান ইব্রহীম ছাড়া আর সকলেই ছিলেন হযরত খাদীজার গর্ভজাত। (সীরাত ইবনে হিশামঃ ১/১৮৭-৯০, ইবন কাছীরঃ ২৬২-৬৫, নবীয়ে রহমত পৃ ১২০, ১২১।)

কা'বার নব নির্মাণ এবং একটি বিরাট ফেতনার অবসানঃ

রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়শরা নতুন ভাবে কা'বা শরীফ নির্মাণ করতে চাইলেন এবং এর উপর ছাদ ঢালাইয়ের মনস্থ করলেন। দেওয়াল যখন উঁচু করে হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরায়শ নেতৃবর্গের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিটি গোত্রই চাচ্ছিল যে, তার গোত্রই এই সৌভাগ্য লাভ করুক এবং তারা এই পাথর উঠিয়ে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করুক। মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে তা যুদ্ধ বিগ্রহে উপণীত হবার উপক্রম হল। মোট কথা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। কুরাইশরা কয়েকদিন যাবত এই সংকটের মাঝে কালক্ষেপণ করল। অতঃপর সকলেই এবিষয়ে একমত হল যে, যে ব্যক্তি অমুক দিন প্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে এ ব্যাপারে ফায়সালা প্রদান করবে। অনন্তর সর্বপ্রথম মসজিদুল হারামের দরজা পথে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন। তাঁকে প্রবেশ করতে দেখেই সবাই সমস্বরে চেচিয়ে উঠে, এই যে আমাদের 'আল আমীন' আসছেন। আমরা তাঁর ফয়সালায় রাজী আছি। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন সর্দার নির্বাচন করলেন এবং একটি চাদর বিচিয়ে নিজ হাতে পাথরটি চাদরের উপর রাখলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের সর্দারকে চাদরের পাশ ধরতে বললেন। তারপর যখন সবাই উঠালেন তখন তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে তার বর্তমান স্থানে রেখে দিলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, সীরাতুন্নাবী-আল্লামা শিবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৪)

হিলফুল ফুযুলঃ

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাফুল ফুযুলেও শরীক ছিলেন যা ছিল আরবদের সবচেয়ে অভিজাত ও সহানুভূতিমূলক পারস্পরিক চুক্তি। তখনকর প্রত্যেক উৎসাহদীপ্ত, সাহসীও ইনসাফের সমর্থক ব্যক্তিরা আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআনের ঘরে একত্রিত হয়ে এই চুক্তি করেন। তারা আল্লাহর নামে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যে, তারা সবাই জালিমের মোকাবেলায় ও মজলুমের সাহার্য সমর্থনে 'এক দেহ এক প্রাণ' হয়ে থাকবে এবং একত্রে মিলে কাজ করবে যতক্ষণ না জালিম মজলুমের হক প্রদাণ করে। কুরায়শরা এই অঙ্গীঁকারের নাম দেয় হালাফুল ফুযুল। রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অঙ্গীকারে খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তিনি এর প্রশংসা করেন এবং বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে জাদ্আন এর ঘরে আমি এমন একটি অঙ্গীকারে শরীক ছিলাম যার দিকে সেই নামে ইসলামের পর আজও যদি আমাকে আহবান করা হয় তবে আমি তাতে সাড়া দেবার জন্য তৈরী আছি। (সীরাতে ইবনে কাছীরঃ ১/২৫৭-৫৯।)

নুবুওয়াত লাভঃ

চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে একাকিত্ব ও নির্জনতা প্রিয়তা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙগঁ অবস্থানে বিরাট তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন। তিনি মক্কার বিভিন্ন ঘাঁটি ও উপত্যকাসমূহ যখন অতিক্রম করতেন তখন গাছ পালা ও প্রস্তর মালা থেকে শব্দ ভেসে আসত 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ '। (আপনার উর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রাসূল।) তিনি ডানে বামে ঘুরে তাকাতেন কিন্তু গাছপালা ও প্রস্তর খন্ড ছাড়া আর কিছুই

দৃষ্টিগোচর হত না। তিনি বলেছেনঃ আমি সেই পাথরকে এখনো চিনি যা আমাকে নবী হওয়ার আগে থেকে সালাম করত। (সহীহ মুসলিম।)

আপনি জানতেন না কিতাব কি ও ঈমান কি?

এসময় তিনি নিজের মধ্যে এক ধরণের অদৃশ্য ও অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন যার কারণ ও উৎস এবং যার ভবিষ্যৎ ও পরিণতি তাঁর জানা ছিলনা। আল্লাহ তাআলা এব্যাপারে বলেছেনঃ "এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতেনা কিতাব কি এবং ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিকে আহবান করবে"। (সূরা শুরাঃ ৫২।)

অন্যত্র বলেনঃ "তুমি আশা করনি যে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সহায় হয়োনা"। (সূরা কাসাসঃ ৮৬।)

হেরা গুহায় জ্যৌতির সাক্ষাৎ

বেশীর ভাগ সময় তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ পাহাড় 'জাবালে নূরে' অবস্থিত 'গারে হেরা' তথা হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক রাত সেখানে অতিবাহিত করতেন। এর ব্যবস্থাও তিনি আগে থেকেই করে নিতেন। এভাবে একদা তিনি হেরা গুহায় তশরীফ আনেন এমন সময় তাঁকে নুবুওয়াতের পদমর্যাদা দিয়ে সৌভাগ্যবান করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১ তম বছরে ২৭ই রমযান মুতাবিক ৬১০ খৃষ্টাব্দ তারিখে পবিত্র শবে ক্বদরে জাগ্রত ও চৈতন্য অবস্থায় এঘটনা সংঘটিত হয়। আল্লাহর ফেরেশতা জিবরীল (আঃ) প্রথমবারের মত তাঁর কাছে, পৃথিবীবাসীদের জন্য আল্লাহর সর্বশেষ ঐষীবাণী, বিশ্বমানবতার মুক্তির পথের দিশারী, জ্বিন ও ইনসানের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান 'আল্ কুরআনুল কারীম' এর সর্বপ্রথম কথাগুলো নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে

তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমন করেন এবং বলেনঃ পড়—ন। তিনি উত্তর দিলেন আমি পড়তে জানি না। এরপর ফেরেশতা তাঁকে বুকের সঙেগঁ জাপটে ধরে চাপ দিলেন যে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। এরপর তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে তিনবার করার পর বললেনঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ-

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

অর্থাৎ "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়! তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা"। (সূরা আলাকঃ ১-৫।)

প্রথম দিন, প্রথম ওহী ও কুরআনের সর্বপ্রথম অংশ। রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আকষ্মিক ঘটনায় খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ভয়ের প্রাবল্যে তাঁর কাঁধ কাঁপছিল। তাড়াহুড়া করে কোন রকম ঘরে পৌঁছলেন।

আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না

ঘরে পৌঁছেই স্বীয় পত্নী হযরত খদীজা (রাঃ) কে বললেনঃ " আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও। আমার বিপদের আশংকা হচ্ছে।" তখন হযরত খদীজা (রাঃ) সুদৃঢ় বিশ্বাস, গভীর আস্তা ও পূর্ণ শক্তিতে বললেনঃ

“কখনো নয়। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করেন, অভাবী লোকের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন, মেহমানের খাতির যত্ন ও মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথে চলতে গিয়ে বিপদ ও সংকটে সাহায্য করেন”। (সহীহ বুখারী, বাবু কায়ফা কানা বদউল ওহী।) হযরত খদীজা কথাগুলো তাঁর সুস্থ প্রকৃতি, আপন জীবনের অভিজ্ঞতা ও লোকের সম্পর্কে জানা-শোনার ভিত্তিতে বলেছিলেন।

ওয়ারাকা ইবন নাওফালের কাছে

কিন্তু তিনি স্বীয় জীবন সাথী কে আরো বেশী অভয় দেয়া এবং শান্তনা দেয়ার জন্য তাঁর জ্ঞানী চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের কাছে নিয়ে যান এবং পূর্ণ ঘটনা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন। ওয়রাকা ছিল বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, নুবুওয়াত ও তার মেজাজ, অধিকন্তু কিতাবীদের সম্পর্কে বেশ ভালবাবে অবহিত এবং পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী ও তাদের জ্ঞানের ব্যাপারে কিছুটা ওয়াকেফহাল।

আপনি এই উম্মতের নবী

ওয়ারাকা শুনতেই বলেনঃ “কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন! আপনি এই উম্মতের নবী। আপনার কাছে সেই নামুসে আকবর এসেছিলেন যিনি মূসা (আঃ) এর কাছে এসেছিলেন। একদিন আসবে যখন আপনার জাতি ও সম্প্রদায় আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং কষ্ট দেবে, আপনাকে বের করে দেবে, আপনার সাথে যুদ্ধ করবে। আমি যদি সেদিন থাকি আর আমার হায়াতে যদি কুলায় তাহলে সর্ব শক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব”। (সহীহ আল বুখারী)

এরপর অনেক দিন যাবত ওহী বন্ধ থাকে। পুনরায় এর ধারা শুরু হয় এবং কুরআন মজীদ নাযিল হতে থাকে।

নিরক্ষর নবীঃ

আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ হেকমতে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লালন পালন হয় নিরক্ষর হিসেবে। তিনি না পড়তে পারতেন না লিখেতে জানতেন। একারণেই সর্বপ্রথম যখন ফেরেশতা তাঁকে পড়তে বললেন তখন তিনি বারবার বললেনঃ আমি পড়তে জানি না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ “তুমি এর আগে কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন কিছু লেখ নি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে”। (সুরা আনকাবুতঃ ৪৮।)

অন্যত্র বলেছেনঃ “যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আছে, যা তাদের কাছে আছে”। (সুরা আ'রাফঃ ১৫৭।)

এটাই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা সম্পূর্ণ আল্লাহরই পক্ষ থেকে, সেখানে তাঁর বানানো কিছু নেই।

গোপনে ইসলামের দাওয়াতঃ

প্রথম দিকে রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ গোপনে করতে থাকেন। আর এভাবেই কেটে যায় তিনটি বছর। এসময় যাঁরা মানুষের মনগড়া নিয়ম-নীতি ধ্যান-ধারণা ও জীবন পদ্ধতির পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও জীবন বিধান দ্বীন ইসলাম কে যারা ধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে স্বাদরে গ্রহন করেছিলেন তারা ছিলেন তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং যারা তাঁর সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল।

প্রথম মুসলিমগণঃ

সর্বপ্রথম হযরত খদীজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হযরত আলী এবং যায়েদ ইবনে হারেছা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হযরত আবুবকর সিদ্দীক ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নছীহতে উসমান, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সা'আদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, ত্বালহা এবং যুবায়র (রাঃ) মুসলমান হলেন। এমনি ভাবে একেরপর এক মুসলমান হওয়া শুরু হল। (আসসীরাতুন নববীয়্যাহ- আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী)

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতঃ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খোলামেলা ও প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ ঘোষিত হয়। ইরশাদ হয়ঃ "অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন।" (সূরা হিজরঃ ৯৪।) "আপনার নিকট আত্নীয় বর্গকে সতর্ক করে দিন আর যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি বিনয়ী হউন।" (সূরা শুআরাঃ ২২৪, ২২৫।) "এবং বলুন, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।" (সূরা হিজর।) এই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। যখন তিনি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করতে শুরু করলেন তখন তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ল।

আবিসিনিয়ার দিকে হিজরতঃ

দুই বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত মক্কা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। পঞ্চম নব্বীতে মুসলমানদের প্রথম একটি দল আবিসিনিয়ার হিজরত করেন। একাফেলাতে ছিল হযরত উসমান ও তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া বিনতে রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত জাফর ইবন আবিতালিব এবং আরো অন্যান্য ছাহাবীগণ।

হযরত হামযা ও উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণঃ

ষষ্ঠ নববীতে হযরত হামযা ও হযরত উমর খাত্তাব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পূর্বে মুসলমানেরা চুপিসারে সালাত আদায় করতেন। তখন থেকে কা'বা শরীফে গিয়ে পড়া শুরু করেন।

সাধারণ বয়কটঃ

সপ্তম নব্বীতে কুরায়শরা এমর্মে একটি লিখিত অঙ্গীকার বা চুক্তিনামা সম্পাদন করল যে, কেউ মুসলমানদের সাথে রেনদেন বা বিয়ে শাদীর সম্পর্ক করবেনা। বনী হাশিমের সাথেও করবেনা যেহেতু তারা রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে দেয়নি। এই চুক্তি নামার পরই বনু হাশিম ও বনু আব্দিল মুত্তালিব তাদের সর্দার আবু তালিবের পিছনে ঐক্যদ্ধ হল, এবং আবু তালিব গিরি বা উপত্যকায় গিয়ে উঠল। আর সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সেই অবরুদ্ধ ও বয়কাটের অবস্থায় তিনটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তিন বছর পর সেই চুক্তিনামা ভঙ্গ ও বয়কটের অবসান ঘটে।

পেরেশানীর বছরঃ

নুবুওয়াতের দশম বর্ষে একই সালে আবু তালিব ও হযরত খদীজা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। এই শোকাবহ ঘটনার পর রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উপর্যুপরী কয়েকটি বিপদের সম্মুখিন হতে হয়। একই বছরে তিনি তায়েফ গিয়ে মানুষদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন। একাদশ নব্বীতে মদীনা শরীফের ছয়জন ব্যক্তি রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম প্রহণ করেন।

মি'রাজঃ

দ্বাদশ নব্বীতে মি'রাজ সংঘটিত হয়। তথায় মুসলমানদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। একই বছর হজ্জের মৌসূমে আঠার জন ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কা আগমন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুছ আ'ব ইবন উমায়রকে তাবলীগের জন্য পাঠান হয় মদীনায়।

হিজরাতঃ

হিজরাতের পর থেকেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতী জীবনের শেষ পর্ব অর্থাৎ মাদানী জীবন শুরু হয়। নুবুওয়াতের ১৩ বছরে প্রায় ছাহাবীগণ ধীরে ধীরে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেলেন। মহিলা এবং শিশুরা ছাড়া প্রসিদ্ধ ছাহাবীদের মধ্যে আবুবকর (রজিঃ) এবং আলী (রজিঃ) ব্যতীত বাকী সবাই মদীনায় হিজরাত করলেন। রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরাতের জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হিজরাতের জন্য অনুমতি দেয়া হল।

হত্যার ষড়যন্ত্র বিফলঃ

এদিকে কুরাইশরা রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৬ শে ছফর তাঁর ঘরকে ঘেরাও করল। কিন্তু তার পরেও -রাখে আল্লাহ মারে কে? তিনি আলী (রাঃ) কে নিজের বিছানায় শুইতে বলে, সুরা ইয়াসীনের শুরুর আয়াতগুলি পড়তে পড়তে, কাফেরদের চোখে ধুল মেরে তাদের সামনে দিয়েই, আল্লাহর হুকুমে একেবারে নিরাপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সফর সঙ্গীঃ

এই বরকতপূর্ণ সফরে আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ই এক মাত্র তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন। রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুবকর সিদ্দীকের ঘরে এসে বললেনঃ আমাকে হিজরাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবুবকর বললেনঃ আমি কি সাথে যাইতে পারি? বললেনঃ হ্যাঁ, তুমিই আমার সাথে যাবে। তারপর দুজন দুটি সাওয়ারিতে সওয়ার হয়ে ২৭ শে ছফর মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ইং পবিত্র জন্মভূমি মক্কাকে 'আলবিদা' বললেন।

ছাওর' গুহায় অবস্থানঃ

মক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে চার/পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর বিশ্রামের জন্য 'ছাওর' নামক পাহাড়ের উপরের গুহায় অবতরণ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তখন আবুবকর (রাঃ) এর কন্যা আসমা (রাঃ) ঘর থেকে খানা পাক করে পৌঁছাতেন। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বকর (রাঃ) মক্কাবাসীদের কথা, পরামর্শ ইত্যাদি পৌঁছাতেন। আর আবুবকর (রাঃ) এর গোলাম আমের ইবনু ফহাইরা ছাগল নিয়ে তাঁদের দুধ দিয়ে আসতেন।

লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনাঃ

এদিকে কাফেররা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার খবর শুনে তাঁকে ধরার জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিল। একদল কাফের তাঁদের কে তালাশ করতে করতে ছাওর পাহাড়ের গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের কেউ তার পায়ের দিকে নজর করলে আমাদের দেখে পেলবে। তখন তিনি বললেনঃ 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা' চিন্তা করনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আবুবকর! সেই দুজনের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? যাঁদের তৃতীয় হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআ'ালা।

মদীনার পথে রওয়ানাঃ

তিন দিন পর্যন্ত গুহায় অবস্থান করার পর প্রথম হিজরীর পহেলা রবিউল আউয়াল সোমবার গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার পথে রওয়ানা করলেন। এদিকে আবুবকর (রাঃ) রাস্তা দেখানোর জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বদলে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সেও এই মহতি সফরে সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল।

কুবায় অবস্থানঃ

প্রথম হিজরী ৮ ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ২০ এ সেপ্টেম্বর ৬২২ ইং সোমবার রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী আবুবকর (রজিঃ) কে নিয়ে মদীনা শরীফের এরিয়ায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে মদীনাবাসীরা সবাই শুভাগমণের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে কিভাবে স্বাগতম জানালেন তা ভাষায় প্রকাশ করে শেষ করার মত নয়। মদীনার এরিয়ায় পৌঁছার পর চার দিন বা মতান্তরে চৌদ্দ দিন পর্যন্ত মদীনার উঁচু স্থান 'কুবা'য় অবস্থান করলেন।

কুবা মসজিদ নির্মাণঃ

কুবায় অবস্থানকালে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। যা পরে 'কুবা মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ হল। এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। যেখানে দুরাকাত ছলাত আদায় করলে মাকবুল উমরার ছাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতি শনিবারে পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ার হয়ে এই মসজিদে আসতেন এবং দুই রাকাত ছলাত আদায় করতেন।

প্রথম জুমার ছলাতঃ

চার দিন বা চৌদ্দ দিন পর জুমাবার আল্লাহর হুকুমে কুবা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন। পথে বনূসালিমের বস্তিতে পৌঁছার পর জুমার ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন সেখানে জুমার ছলাত আদায় করলেন। জুমার পর পুনরায় সওয়ার হয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন।

আল্লাহ নির্দেশীতে স্থানে অবতরণঃ

মদীনাবাসীরা সবাই আল্লাহর রাসূলকে নিজ নিজ ঘরে মেহমান হিসেবে পাওয়ার বড় আকাঙ্কায় ছিল। কিন্তু রাসলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা উটের লাগাম ছেড়ে দাও। কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। পরে আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) এর ঘরের সামনে অর্থাৎ বর্তমান যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত, সেখানে গিয়ে তাঁর উট বসে গেল। তখন তিনি বললেনঃ এটিই স্থান। অতঃপর তিনি আবুআইয়ূব আনছারী (রাঃ) এর ঘরে মেহমান হলেন। সাত মাস পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এভাবে তাঁর মাদানী জীবন শুরু হল।

পরিবারের সবাইকে মক্কা থেকে নিয়ে আসাঃ

হিজরাতের প্রায় ছয় মাস পর রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইদ ইবন হারেছা (রাঃ) এবং আবু রাফে (রাঃ) কে ফাতেমা (রাঃ), উম্মে কালছুম (রাঃ), উম্মুল মুমিনীন সাওদা (রাঃ), উম্মে আয়মান (রাঃ) ও উসামা ইবন যায়দ (রাঃ)কে নিয়ে আসার জন্য মক্কা পাঠালেন। তাঁদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবন আবিবকর তাঁর পিতার আদেশে আবু বকর (রাঃ) এর পরিবার, উম্মে রুমান (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)কে নিয়ে মদীনায় চলে আসলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণঃ

মদীনা শরীফ পৌঁছার পর প্রথম মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি ছিল নবীর হাতে প্রতিষ্ঠিত সর্বশেষ মসজিদ। যেহেতু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শেষ নবী। তাঁর পরে অন্য কোন নবী আসার কোন অবকাশ নেই, সেহেতু তাঁর হাতের গড়া মসজিদটিও ছিল সর্বশেষ নববী মসজিদ। এই মসজিদের নির্মাণ কার্যে ছাহাবীদের সাথে তিনি নিজেও অংশ

গ্রহন করেন। এই মসজিদের অনেক বৈশিষ্ট ও গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ (নবীর হাতে নির্মিত) সর্বশেষ মসজিদ। তিনি আরো বলেছেনঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছাওয়াবের আশায়) অন্যত্র সফর করা যাবে না। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী)। এই মসজিদে এক নামায পড়া, মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সব মসজিদে এক হাজার নামায পড়ার সমান। মদীনায় আসার পর থেকে জুহর, আছর এবং এশার নামায চার রাকাত করে পড়া শুরু হল।

আযানের সূচনাঃ

জামাতে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে লোকজনকে আহবান করার পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহর হুকুমে আযানের প্রথা চালু হল।

ভ্রাতৃত্ব স্থাপনঃ

মদীনায় হিজরাত করার পর প্রথম বছর যে কাজগুলি করেছেন সেগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আনছার মুহাজির তথা মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

কেবলা পরিবর্তনঃ

দ্বিতীয় হিজরীতে কেবলা পরিবর্তন করা হল অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফকে নামাযের জন্য কেবলা নির্ধারণ করা হল। রমযান মাসের রোযা ফরয করা হল।

বদর যুদ্ধঃ

একই বছরে ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হল। এযুদ্ধে মুসলমানদের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। শত্র“দের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। ইসলামের মুজাহিদগণ এই যুদ্ধে এক অবর্ণনীয় বিজয় লাভ করল। শত্র“ নেতা আবু জাহাল সহ কুরাইশের সত্তর জন বড় বড় নেতা নিহত হল এবং ৭০ জন বন্দী হল। মুজাহিদগণের মধ্যে চৌদ্দজন শাহাদত বরণ করলেন।

উহুদ যুদ্ধঃ

তৃতীয় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাঁত মোবারক শহীদ হল। মুসলমানদের মধ্য থেকে সত্তর জন শাহাদত বরণ করলেন। এই বছর যাকাত ফরয করা হল।

মদ পান নিষিদ্ধ ঘোষণাঃ

চতুর্থ হিজরীতে মদ পান নিষিদ্ধ করা হল। বনু নযীরে ইহুদীদেরকে অবরোধ করে রাখা হল। ১৫ দিনপর অবরোধ শেষ হল।

পঞ্চম হিজরীতে মহিলাদের পর্দার বিধান নাযিল হল। আর গাযওয়া আহযাব তথা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হল। খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হল।

হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ

ষষ্ট হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সাক্ষরীত হল। এটি ছিল মুসলিমদের জন্য প্রকৃত পক্ষে মহান বিজয়ের সুচনা। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশ বিদেশের বড় বড় রাজা সম্রাটদের কাছে চিঠি পত্র লেখতে শুরু করলেন।

মক্কা বিজয়ঃ

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল। কা'বা শরীফ থেকে মুর্তিগুলো সরিয়ে দেয়া হল। পরিপূর্ণভাবে তাকে পবিত্র করা হল।

বিদায়ী হজ্জঃ

নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। আর তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। দশম হিজরীতে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করলেন। একলক্ষ চোচল্লি¬শ হাজার মুসলমান তাঁর সঙেগঁ হজ্জ আদায় করেন। এটিই ছিল হাজ্জাতুল ওয়াদা বা বিদায়ী হজ্জ।

ইন্তেকালঃ

নুবুওয়াত লাভের পর তিনি ২৩ বছর পাঁচ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে উম্মতকে দ্বীন শিক্ষা দেন। ২৯ শে ছফর সোমবার মৃত্যুরোগ আরম্ভ হয়। ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার চাশতের সময় ৬৩ বছর চারদিনের বয়সে পবিত্রাত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড়ে ইন্তিকাল করেন সেই কাপড়েই তাঁকে গোসল দেয়া হয়। গোসল এবং কাফন পরানোর কাজে আলী (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ), শাকরান (রাঃ), আউস ইবন খাউলী (রাঃ) ফযল ইবন আব্বাস (রাঃ) এবং কাছাম ইবন আব্বাস (রাঃ) শরীক ছিলেন। দাফন কোথায় করা হবে সেই প্রশ্নের উত্তরে আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেনঃ নবীদের কে সেখানেই দাফন করতে হয়, যেখানে তাঁরা ইন্তিকাল করেন। তারপর আবুতালহা (রাঃ) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) এর কামরায় কবর খনন করেন। তারপর মুসলিমগণ পালা পালা করে কামরায় প্রবেশ করে জানাযার ছলাত আদায় করেন। প্রথমে পুরুষেরা তারপর মহিলারা তারপর শিশুরা। জানাযার জন্য কেউ ইমাম ছিলনা। ১৪ই রবিউল আওয়াল বুধবার রাত্রে দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পবিত্রাত্মা পত্নীগণঃ

(১) খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রাঃ)

(২) ছাউদা বিনতু যামআহ (রাঃ)

(৩) আয়েশা বিনতু আবিবকর (রাঃ)

(৪) হাফছা বিনতু উমর (রাঃ)

(৫) যায়নাব বিনতু খুযায়মা (রাঃ)

(৬) উম্মু সালামা হিন্দ বিনতু আবি উমাইয়্যা (রাঃ)

(৭) যায়নাব বিনতু জাহাশ (রাঃ)

(৮) জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রাঃ)

(৯) উম্মু হাবীবা রামলা বিনতু আবি সুফয়ান (রাঃ)

(১০) সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই (রাঃ)

(১১) মায়মুনা বিনতু হারিছ (রাঃ)।

একসাথে সর্বোচ্চ নয় জন পত্মী ছিলেন।

তাঁর বাঁদীগণঃ

(১) রায়হানা বিনতু যায়েদ আন নযরিয়্যাহ (রাঃ) তিনি ৫ম হিজরীতে বাঁদী হিসেবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাম্পত্য জীবনে শরীক হলেন।

(২) মারিয়া কিবতিয়্যাহ (রাঃ) তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পর বাঁদী হিসেবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাম্পত্য জীবনে শরীক হলেন।

পবিত্র সন্তান-সন্ততিঃ

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতানৈক্য রয়েছে। তবে কাসেম (রাঃ) এবং ইব্রাহীম (রাঃ) সম্পর্কে সভাই একমত। কেউ কেউ আরো তিনজন ছেলের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলেনঃ- আব্দুল্লাহ (রাঃ), তৈয়ব (রাঃ) এবং তাহের (রাঃ)। আবার কেউ বলেছেন তৈয়ব এবং তাহের দুটি আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর উপাধী ছিল।

পুত্র সন্তানগণঃ

১ – আল কাসিম (রাঃ), তিনি খদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালেই মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম সন্তান। একারণেই নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ‘আবুল কাসেম’ বলে ডাকা হত।

২ – আব্দুল্লাহ (তৈয়ব ও তাহির রাঃ) তিনিও খদীজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালে মৃত্যু বরণ করেন।

৩ – ইব্রাহীম (রাঃ) তিনি মারিয়া কিবিতয়া (রাঃ) এর গর্ভে জন্মলাভ করেন এবং বাল্যকালে মৃত্যু বরণ করেন।

কন্যা সন্তানগণঃ

৪ – যায়নাব (রাঃ) তিনি আবুল আ’ছ (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৫ – রুকাইয়া (রাঃ) তিনি উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৬ – উম্মু কালছুম (রাঃ) তিনিও উসমান (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৭ – ফাতিমা (রাঃ) তিনি আলী (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

নাতি-নাতনীগণঃ

* যায়নাব (রাঃ) এর গর্ভেঃ

১ – আলী (রাঃ),

২ – উমামা (রাঃ)।

* রুকাইয়া (রাঃ) এর গর্ভেঃ

৩ – (রাঃ)

* উম্মুকালছুম (রাঃ) এর গর্ভেঃ

কোন সন্তান নেই

* ফাতিমা (রাঃ) এর গর্ভেঃ

৪ – হাসান (রাঃ),

৫ – হুসাইন (রাঃ),

৬ – মুহসিন (রাঃ),

৭ – উম্মু কালছুম (রাঃ),

৮ – যায়নাব (রাঃ)